গল্প

আত্মহত্যার অধিকার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মহত্যার অধিকার

বর্ষাকালেই ভয়ানক কষ্ট হয়।

ঘরের চালটা একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে। কিছু নারিকেল আর তাল-পাতা মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই কুড়াইয়া সংগ্রহ করা গিয়াছিল। চালের উপর সেগুলি বিছাইয়া দিয়া কোনো লাভ হয় নাই। বৃষ্টি নামিলেই। ঘরের মধ্যে সর্বত্র জল পড়ে।

বিছানাটা গুটাইয়া ফেলিতে হয়, ভাঙা বাক্সপেটরা কয়টা এ কোণে টানিয়া আনিতে হয়, জামাকাপড়গুলি দড়ি হইতে টানিয়া নামাইয়া পুঁটলি করিয়া, কোথায় রাখিলে যে ভিজিবে কম, তাই নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়।

বড় ছেলেটা কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আদর করিয়া তাহার কান্না থামানো যায় না, ধমক দিলে কান্না বাড়ে। মেয়েটা বড় হইয়াছে, কাঁদে না; কিন্তু ওদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া এমন করিয়াই চাহিয়া থাকে যে নীলমণির ইচ্ছা হয় চড় মারিয়া ওকেও সে কাঁদাইয়া দেয়। এতক্ষণ ঘুমাইবার পর এক ঘণ্টা জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইল বলিয়া ও কী চাহনি? আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, ঘরের চাল সাত বছর মেরামত হয় নাই। ঘরের মধ্যে জল পড়াটা নীলমণির এমন কী অপরাধ যে মেয়েটা তাকে ও-রকম ভাবে নিঃশব্দে গঞ্জনা দিবে?

ছোট ছেলেটাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া নিভা একবার এধার একবার ওধার করিয়া বেড়াইতেছিল।

হঠাৎ বলিল, ওগো, ছাতিটা একবার ধরো, একেবারে ভিজে গেল যে! লক্ষ্মী, ধরো একবার ছাতিটা খুলে। ওরও কি শেষে নিমুনিয়া হবে?

নীলমণি বলিল, হয়তো হবে। বাঁচবে।

নিভা বলিল, বালাই, ষাট।–শ্যামা, তুইও তো ধরতে পারিস ছাতিটা একটু?

শ্যামা নীরবে ভাঙা ছাতিটা নিভার মাথার উপর ধরিল। ছাতি মেলিবার বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়া গেল। প্রদীপে তেল পুড়িতেছে। অপচয়! কিন্তু উপায় নাই। চাল-ভেদ-করা বাদলে ঘর যখন ভাসিয়া যাইতেছে তখনকার বিপদে প্রদীপের আলোর একান্ত প্রয়োজন। জিনিসপত্র লইয়া মানুষগুলি একোণ ওকোণ করিবে কেমন করিয়া?

এক ছিলুম তামাক দে শ্যামা। নীলমণি হুকুম দিল।

শ্যামা বলিল, ছাতিটা ধরো তবে।

নীলমণি আকাশের বজ্রের মতো ধমকাইয়া উঠিল : ফেলে দে ছাতি, চুলোয় খুঁজে দে। আমি ছাতি ধরব তবে উনি তামাক সাজবেন, হারামজাদী!

তামাক অবিলম্বেই হাতের কাছে আগাইয়া আসিল। ঘরের পশ্চিম কোণ দিয়া কলের জলের মতো মোটা ধারায় জল পড়িয়া ইতিমধ্যেই একটা বালতি ভরিয়া গিয়াছে। সেই জলে হাত ধুইয়া শ্যামা বলিল, তামাক আর একটুখানি আছে বাবা।

দুঃসংবাদ!

এত বড় দুসংবাদ-প্রদানকারিণীকে একটা গাল দিবার ইচ্ছা নীলমণিকে অতি কষ্টে চাপিয়া যাইতে হইল।

নীলমণি ভাবিল : বিনা তামাকে এই গভীর রাত্রির লড়াই জিতিব কেমন করিয়া? ছেলের কান্না দুই কানে তীরের ফলার মতো বিধিয়া চলিবে, মেয়েটার মুখের চাহনি লঙ্কাবাটার মতো সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে, নিমুনিয়ার সঙ্গে নিভার ব্যাকুল কলহ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া শিহরিয়া মনে হইবে বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন–আর ঘরে এখন তামাক আছে একটুখানি।

তামাক আনানো হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নীলমণি চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্ন করা অনর্থক, জবাব সে পরশু হইতে নিজেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে-পয়সা নাই। ছেলেটা বিকালে এক পয়সার মুড়ি খাইতে পায় নাই-তামাকের পয়সা কোথা হইতে আসিবে! নিজে গেলে হয়তো দোকান হইতে ধার আনিতে পারি, কিন্তু

নীলমণি খুশি হয়। এতক্ষণে ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

তামাক নেই বিকেলে বলিসনি কেন?

আমি দেখিনি বাবা।

দেখিনি বাবা! কেন দেখনি বাবা? চোখের মাথা খেয়েছিলে?

তুমি নিজে সেজেছিলে যে? সারাদিন আমি একবারও তামাক সাজিনি বাবা!

তা সাজবে কেন? বাপের জন্য তামাক সাজলে সোনার অঙ্গ তোমার ক্ষয়ে যাবে যে!

নীলমণির কান্না আসিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া সহসা উদ্গত অশ্রু সে দমন করিয়া লইল। না আছে তামাক, না থাক। পৃথিবীতে তার কী-ই বা আছে যে তামাক থাকিলেই সব দুঃখ দূর হইয়া যাইত!

বাহিরে যেন অবিরল ধারে জল পড়িতেছে না, ঘরের বায়ু যেন সাহারা হইতে আসিয়াছে, নীলমণির চোখ-মুখ এত জ্বালা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হইতে তাহার হাঁটুর উপর বড় বড় ফোঁটার জল পড়িতেছিল-টপ টপ। অঞ্জলি পাতিয়া নীলমণি গুনিয়া গুনিয়া জলের ফোঁটাগুলি ধরিতে লাগিল। সিদ্ধ-করা চামড়ার মতো ফ্যাকাশে ঠোঁট নাড়িয়া সে কী বলিল, ঘরের কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। ছেলেমানুষের মতো তাহার জলের ফোঁটা সঞ্চয় করার খেলাটাও কেহ চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু হাতে খানিকটা জল জমিলে তাই দিয়া মুখ ধুইতে গিয়া নীলমণি ধরা পড়িয়া গেল।

নিভা ও শ্যামা প্রতিবাদ করিল দুজনেই।

শ্যামা বলিল, ও কী করছ বাবা?

নিভা বলিল, পচা গলা চাল-ধোয়া জল, হ্যাগো, ঘেন্নাও কি নেই তোমার?

নীলমণি হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, হোক না পচা জল। চাল-ধোয়া জল তো! এও হয়তো কাল জুটবে না নিভা!

ইহাকে সূক্ষ্ম রসিকতা মনে করিয়া নীলমণি নিজের মনে একটু গর্ব অনুভব করিল। এমন অবস্থাতেও রসিকতা করিতে পারে, মনের জোর তো তার সহজ নয়। ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া আনিয়া নিভার মুখের দিকে পুনরায় চাহিতে গিয়া কিন্তু তার হাসি ফুটিল না। নিভার দৃষ্টির নির্মমতা তাকে আঘাত করিল।

অবিকল শ্যামার মতো চাহিয়া আছে! এত দুঃখ, এত দুর্ভাবনা ওর চোখের দৃষ্টিকে কোমল করিতে পারে নাই, উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, রূঢ় ভর্ৎসনা আর নিঃশব্দ অসহায় নালিশে ভরিয়া রাখিয়াছে।

নীলমণি মুষড়াইয়া পড়িল।

সব অপরাধ তার। সে ইচ্ছা করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্যে পরিতুষ্ট পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তারই ইচ্ছাতে রাতদুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু তাই নয়। ওদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবার মন্ত্র সে জানে। মুখে ফিসফিস করিয়া হোক, মনে মনে নিঃশব্দে হোক, ফুসমন্তরটি একবার আওড়াইয়া দিলেই তার এই ভাঙা ঘর সরকারদের পাকা দালান হইয়া যায়, আর ঘরের কোণার ওই ভাঙা বাক্সটা চোখের পলকে মস্ত লোহার সিন্দুক হইয়া ভিতরে টাকা ঝমঝম করিতে থাকে-টাকার ঝমঝমানিতে বৃষ্টির ঝমঝমানি কোনোমতেই আর শুনিবার উপায় থাকে না।

কিন্তু মন্ত্রটা সে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না।

.

ঘণ্টাখানেক এমনিভাবে কাটিয়া গেল।

নিভা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাগো, রাত কত?

তা হবে, দুটো-তিনটে হবে।

একটা কিছু ব্যবস্থা করো! সারারাত জল না ধরলে এমনি বসে বসে ভিজব?

বসে ভিজতে কষ্ট হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজো।

নিভা আর কিছু বলিল না। ছেঁড়া আলোয়ানটি দিয়া কোলের শিশুকে আরো ভালো করিয়া ঢাকিয়া রুক্ষ চুলের উপর খসিয়া-পড়া ঘোমটাটি তুলিয়া দিল। স্বামীর কাছে মাথায় কাপড় দেওয়ার অভ্যাস সে এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ছাতি ধরিয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া শ্যামা তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, মধ্যে মধ্যে তার শিহরণটা নিভা টের পাইতে লাগিল।

কাঁপছিস কেন শ্যামা? শীত করছে?

শ্যামা কথা বলিল না। একটু মাথা নাড়িল মাত্র।

নিভা বলিল, তবে ভালো করেই ছাতিটা ধর বাবু, খোকার গায়ে ছিটে লাগছে।

আঁচল দিয়া সে খোকার মুখ মুছিয়া লইল। ফিসফিস করিয়া আপন মনে বলিল, কত জন্ম পাপ করেছিলাম, এই তার শাস্তি। নীলমণি শুনিতে পাইল, কিন্তু কিছু বলিল না। মন তার সজাগ, নির্মমভাবে সজাগ, কিন্তু চোখের পাতা দিয়া দুই চোখকে সে অর্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, একান্ত নির্বিকার চিত্তেই সে ঝিমাইতেছে।

কিন্তু নীলমণি সবই দেখিতে পায়। তার স্তিমিত দৃষ্টিতে নিভার মুখে তেরচা হইয়া বাঁকিয়া যায়, প্রদীপের শিখাটা ফুলিয়া ফাপিয়া ওঠে, দেয়ালের গায়ে ছায়াগুলি সহসা জীবন পাইয়া দুলিয়া উঠিতে শুরু করে। মুখ না ফিরাইয়াই নীলমণি দেখিতে পায়, ঘরের ও-কোণে গুটাইয়া রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরক্তির তার সীমা থাকে না। তার মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুই পা মেঝের জলস্রোতে প্রসারিত করিয়া দিয়া আকাশের গলিত মেঘে অর্ধেকটা শরীর ভিজাইতে ভিজাইতে ওইটুকু ছেলের অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ার আর কী মানে হয়? এর চেয়ে ও যদি নাকী সুরে টানিয়া টানিয়া শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত তাও নীলমণির ভালো ছিল। এ সহ্য হয় না। সন্ধ্যায় ও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই; ক্ষুধার জ্বালায় মাকে বিরক্ত করিয়া পেটের জ্বালায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘুমাইয়াছিল। হয়তো ওর রূপকথার পোষা বিড়ালটি এই বাদলে রাজবাড়ির ভালো ভালো খাবার ওকে চুরি করিয়া আনিয়া দিতে পারে নাই। হয়তো ঘুমের মধ্যেই ওর গালে চোখের জলের শুকনো দাগ আবার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে দুঃখের এই প্রকৃত বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ও তবে ঘুমায় কোন হিসাবে?

নিমুকে তুলে দে তো শ্যামা।

নিভা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কেন, তুলবে কেন? ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।

ঘুমোচ্ছে না ছাই। ইয়ার্কি দিচ্ছে। ঢং করছে।

হ্যাঁ, ইয়ার্কি দিচ্ছে! ঢং করছে! যেমন কথা তোমার! ঢং করার মতো সুখেই আছে কিনা!

আধ-ঢাকা চোখ নীলমণি একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল। ওরা যা খুশি করুক, যা খুশি বলুক। সে আর কথাটি কহিবে না।

খানিক পরে নিভা বলিল, দ্যাখো, এমন করে আর তো থাকা যায় না। সরকারদের বাইরের ঘরটাতে উঠিগে চলো।

নীলমণি চোখ না খুলিয়াই বলিল, না।

নিভা রাগ করিয়া বলিল, তুমি যেতে না চাও থাকো, আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি।

নীলমণি চোখ মেলিয়া চাহিল।

না-যেতে পাবে না। ওরা ছোটলোক। সেবার কী বলেছিল মনে নেই?

বললে আর করছ কী শুনি? রাতদুপুরে বিরক্ত করলে অমন সবাই বলে থাকে।

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, বলে থাকে? রাতদুপুরে বিপদে পড়ে মানুষ আশ্রয় নিতে গেলে বলে থাকে-এ কী জ্বালাতন? ওইটুকু শিশুর জন্য একটু শুকনো ন্যাকড়া চাইলে বলে থাকে কাপড়জামা সব ভিজে? ময়লা হবার ভয়ে ফরাশ তুলে নিয়ে ছেঁড়া শতরঞ্চি অতিথিকে পেতে দেয়?-যেতে হবে না। বাস।

নিভা অনেক সহ্য করিয়াছে। এবার তার মাথা গরম হইয়া গেল।

ছেলে মেয়ে বৌকে বর্ষাবাদলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিতে পারে না, অত মান-অপমান-জ্ঞান কী জন্যে? আজ বাদে কাল ভিক্ষে করতে হবে না?

নীলমণি বলিল, চুপ।

এক ধমকেই নিভা অনেকখানি ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

চুপ করেই আছি চিরটা কাল। অন্য মানুষ হলে–

হাতের কাছে, ঘটিটা তুলিয়া লইয়া নীলমণি বলিল, চুপ। একদম চুপ। আর একটি কথা কইলে খুন করে ফেলব।

কথা কেউ বলছে না। নিভা একেবারে নিভিয়া গেল।

শ্যামা ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাপের গর্জনে সে চমকাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, মা, ভুলু দরজা আঁচড়াচ্ছে।

গরিবের মেয়ে, হা-ঘরের বৌ, নিভার মেরুদণ্ড বলিতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার বদলে যা ছিল নিরপরাধ মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আঁচড়াচ্ছে তো কী হবে? কোলে তুলে নিয়ে এসে নাচ!–ভালো করে ছাতি ধরে থাক শ্যামা, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব।

নীলমণি বলিল, আমার লাঠিটা কই রে?

শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া গেল। সে মিনতি করিয়া বলিল, মেরো না বাবা। দরজা খুললে ও আপনি চলে যাবে।

তোকে মাতব্বরি করতে হবে না, বুঝলি? চুপ করে থাক। বাঁ পা-টি আংশিকভাবে অবশ, হাতে ভর দিয়া নীলমণি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণায়। তার মোটা বাঁশের লাঠিটা ঠেস দেওয়া ছিল, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া লাঠিটা সে আয়ত্ত করিল। উঠানবাসী লোমহীন নির্জীব কুকুরটার উপর তার সহসা এত রাগ হইয়া গেল কেন কে জানে। বেচারি খাইতে পায় না, কিন্তু প্রায়ই অদৃষ্টে প্রহার জোটে, তবু সে এখানেই পড়িয়া থাকে, সারারাত শিয়াল তাড়ায়। শ্যামা একটু করুণার চোখে না দেখিলে এত দিনে ওর অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া যাইত। কিন্তু নীলমণি কুকুরটাকে দেখিতে পারে না। পুঁকিতে ধুকিতে লাথিঝাটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া তার ঘৃণা হয়, গা জ্বালা করে।

শ্যামা আবার বলিল, মেরো না বাবা, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, মারব? মার খেয়ে আজ রেহাই পাবে ভেবেছিস? আজ ওর ভব-যন্ত্রণা দূর করে ছাড়ব।

ভব-যন্ত্রণা নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্যামা শুনিবে কেন? পেটের ক্ষুধায় এখনো তার কান্না। আসে, ছেঁড়া কাপড়ে তার সর্বাঙ্গ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; তার বুকে ভাষা আছে, মনে আশা আছে। ভব-যন্ত্রণা সহ্য করিতে তার শক্তির অকুলান হয় না, বরং একটু বাড়তিই হয়। ওইটুকু শক্তি দিয়া সে বর্তমান জীবন হইতেও রস নিংড়াইয়া বাহির করে-হোক পানসা, এও তুচ্ছ নয়। ভুলুর মতো কুকুরটিকেও মারিবার অথবা তাকে মারিবার কল্পনা শ্যামার কাছে বিষাদের ব্যাপার। তার সহ্য হয় না।

ছাতি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া শ্যামা নীলমণির লাঠি ধরিল। কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, না বাবা, মেরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা!

নীলমণি গর্জন করিয়া বলিল, লাঠি ছাড় শ্যামা, ছেড়ে দে বলছি। তোকেই খুন করে ফেলব আজ।

শ্যামা লাঠি ছাড়িল না। তারও কি মাথার ঠিক আছে? লাঠি ধরিয়া রাখিয়াই সে বারবার নীলমণির পায়ে পড়িতে লাগিল।

নিভা বলিল, কী জিদ মেয়ের! ছেড়েই দে না বাবু লাঠিটা।

রাগে কাঁপিতে কাপিতে নীলমণি বলিল, জিদ বার করছি।

লাঠিটা নীলমণিকে মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইল; কিন্তু বেড়ার ঘরের বেড়ার অনেকগুলি বাতাই আলগা ছিল।

.

মেয়েকে মারিয়া নীলমণির মন এমন খারাপ হইয়া গেল বলিবার নয়। না মারিয়া অবশ্য উপায় ছিল না। ও-রকম রাগ হইলে সে কখনো সামলাইতে পারে নাই, কখনো পারিবেও না। মন খারাপ হওয়ার কারণটাও হয়তো ভিন্ন। কে বলিতে পারে? মেয়েকে না মারিয়াও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে!

জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু, শোকের তো অভাব নেই। মন খারাপ হইবার কারণ জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ঘুমানোর সময় দুঃস্বপ্নে!

কয়েক মিনিট আগে বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছিল; হঠাৎ আবার আগের চেয়েও জোরে আরম্ভ হইয়া গেল। নীলমণির মান-অপমান জ্ঞানটা এবার আর টিকিল না।

লণ্ঠনে তেল আছে শ্যামা?

শ্যামা একবার ভাবিল চুপ করিয়া থাকিয়া রাগ আর অভিমান দেখায়। কিন্তু সাহস পাইল না।

একটুখানি আছে বাবা।

জ্বাল তবে।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, লণ্ঠন কী হবে?

সরকারদের বাড়ি যাব। ফের চেপে বৃষ্টি এল দেখছ না?

যেন, সরকারদের বাড়ি যাইতে নিভাই আপত্তি করিয়াছিল।

শ্যামা বলিল, দেশলাই কোথা রাখলে মা?

নিভা বলিল, দেশলাই? কেন, পিদিম থেকে বুঝি লণ্ঠন জ্বালানো যায় না? চোখের সামনে পিদিম জ্বলছে, চোখ নেই?

নীলমণি বলিল, ওর কি জ্ঞান-গম্যি কিছু আছে?

নিজের মুখের কথাগুলি খচখচ করিয়া মনের মধ্যে বেঁধে। এ যেন তোতাপাখির মতো অভাবগ্রস্তের মানানসই মুখস্থ বুলি আওড়ানো। বলিতে হয় তাই বলা; না বলিলে চলে না সত্য; কিন্তু আসলে বলিয়া কোনো লাভ নাই।

সাত বছরের পুরনো লণ্ঠন জ্বালানো হইল।

নিভা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবু, ছাতিতে আটকাবে না। আর একখানা কাপড় জড়িয়ে নি। দে তো শ্যামা, শুকনো কিছু দে তো। আর এক কাজ কর–দুটো-তিনটে কাপড় পুঁটলি করে নে। ওখানে গিয়ে সবাইকে কাপড় ছাড়তে হবে। আমার দোক্তার কৌটো নিস।

নীলমণি একটু মিষ্টি করিয়াই বলিল, হুঁকোটা নিতে পারবি শ্যামা? লক্ষ্মী মা আমার– পারবি? জল ফেলেই নে না, ওখানে গিয়ে ভরে নিলেই হবে। জলের কি অভাব?– তামাকটুকু ফেলে যাস নে ভুলে।

সব ব্যবস্থাই হইল, নিমুর কান্নায় কর্ণপাত না করিয়া তাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া পিঠে একটা ছেঁড়া চটের বস্তা চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দরজা খুলিয়া তারা উঠানে নামিয়া গেল। উত্তরের ভিটার ঘরখানা গত বৎসরও খাড়া ছিল, এবারকার চতুর্থ বৈশাখী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে; সময়মতো অন্তত দুটি খুঁটি বদলাইতে পারিলেও এটা ঘটিত না। ভুলু বোধ হয় ওই ভগ্নস্তূপের মাঝেই কোথাও। মাথা গুঁজিয়া ছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন ঘরের দরজায় তালা লাগানো হইয়া গিয়াছে। দরজা আঁচড়াইয়া ভুলু সকরুণ কান্নার সঙ্গে কুকুরের ভাষায় বলিতে লাগিল–দরজা খোলো, দরজা খোলো।

বাড়ির সামনে একহাঁটু কাদা, তার পরেই পিছলে এঁটেল মাটি। ছেলে লইয়া আছাড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়া নিভা দেবতাকেই গাল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কষ্ট

নীলমণিরই বেশি; শুকনো ডাঙাতেই বা পায়ের পদক্ষেপটি তাকে চট করিয়া ডিঙাইয়া যাইতে হয়-এখন তার পা আর লাঠি দুই কাদায় ঢুকিয়া যাইতে লাগিল।

লাঠি টানিয়া তুলিলে পা আটকাইয়া থাকে, পা তুলিলে লাঠি পোঁতা হইয়া যায়। নিভার তাকাইবার অবসর নাই। শ্যামার ঘাড়ে কাপড়ের পুঁটলি, হুঁকা কলকি, লণ্ঠন আর নিমুর ভার। তবু শ্যামাই নীলমণির বিপদ উদ্ধার করিয়া দিতে লাগিল।

ঘোষেদের পুকুরটা পাক দিলে সরকারদের বাড়ি। পুকুরটা ভরিয়া গিয়া পাড় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম কোণার প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটার তলা দিয়া তিন-চারি হাত। চওড়া এক সংক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনী সৃষ্টি হইয়াছে। তেঁতুলগাছটার জমকালো আবছা চেহারা দেখিলে গা ছমছম করে। ভরপুর পুকুরের বুকে শ্যামার হাতের আলো যে লম্বা সোনালি পাত ফেলিয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্তে হাজার বৃষ্টির ফোঁটায় তাহা অজস্র। টুকরায় ভাঙিয়া যাইতেছে।

নীলমণি থমকিয়া দাঁড়াইল। কাতর স্বরে বলিল, ও শ্যামা, পার হব কী করে!

শ্যামা বলিল, জল বেশি নয় বাবা, নিমুর হাঁটু পর্যন্তও ওঠে নি। চলে এসো।

সুখের বিষয় স্রোতের নিচে কাদা ধুইয়া গিয়াছিল, নীলমণির পা অথবা লাঠি আঁটিয়া গিয়া তাকে বিপন্ন করিল না, তবু এতখানি সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও, নীলমণির দুচোখ একবার সজল হইয়া উঠিল। বাহির হওয়ার সময় সে কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া লইয়াছিল, এখন ভিজিয়া গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ হইতে জোর বাতাস উঠিয়াছিল, নীলমণির শীত করিতে লাগিল। জগতে কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যায় গাঢ় ঘুমে পাশ ফিরিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে-সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া টানিয়া সে তখন চলিয়াছে। কোথায়? যে-প্রকৃতির অত্যাচারে ভাঙা ঘরে টিকিতে না পারিয়া তাকে আশ্রয়ের খোঁজে পথে নামিয়া আসিতে হইল, সেই প্রকৃতিরই দেওয়া নির্মমতায় হয়তো সরকাররা দরজা খুলিবে না, ঘুমের ভান করিয়া বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। না, নীলমণি আর যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে; পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান-সে কোন

দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?

স্রোত পার হইয়া গিয়া লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শ্যামা দাঁড়াইয়া আছে। পাশেই ভরাট পুকুরটা বৃষ্টির জলে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। নীলমণি সাঁতার জানিত না। কিন্তু জানিত যে পুকুরের পাড়টা এখানে একেবারে খাড়া! একবার গড়াইয়া পড়িলেই অথই জল, আর উঠিয়া আসিতে হইবে না।

নিভা তাড়া দিতেছিল। শ্যামা বলিল, বাবা, চলে এসো। দাঁড়ালে কেন?

নীলমণি চলিতে আরম্ভ করিল; ডাইনে নয় বাঁয়েও নয়। সাবধানে, সোজা শ্যামার দিকে।

হঠাৎ শ্যামা চিৎকার করিয়া উঠিল, মাগো, সাপ!

পরক্ষণে আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল, সাপ নয় গো সাপ নয়, মস্ত শোল মাছ! ধরেছি ব্যাটাকে। ইঃ, কী পিছল!

তাড়াতাড়ি আগাইবার চেষ্টা করিয়া নীলমণি বলিল, শক্ত করে ধর, দুহাত দিয়ে ধর– পালালে কিন্তু মেরে ফেলব শ্যামা!

.

সরকাররা বছর তিনেক দালান তুলিয়াছে। এখনো বাড়িসুদ্ধ সকলে বাড়ি বাড়ি করিয়া পাগল। বলে, বেশ হয়েছে, না? দোতলায় দুখানা ঘর তুললে, বাস, আর দেখতে হবে না।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সরকারদের বড় ছেলে বাহিরের ঘরের দরজা খুলিল। বলিল, ব্যাপার কী? ডাকাত নাকি?

নীলমণি বলিল, না ভাই, আমরা। ঘরে তো টিকতে পারলাম না ভায়া, সব ভেসে গেছে। ভাবলাম তোমাদের বৈঠকখানায় তো কেউ শোয় না, রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে আসি।

বড় ছেলে বলিল, সন্ধ্যাবেলা এলেই হত!

নীলমণি কষ্টে একটু হাসিল : সন্ধ্যায় কি বৃষ্টি ছিল ভাই? দিব্যি ফুটফুটে আকাশ-মেঘের চিহ্ন নেই। রাতদুপুরে হঠাৎ জল আসবে কে জানত।

নিভা ছাতি বন্ধ করিয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাসিকের ছবির সদ্যস্নাতার অবস্থায় পড়িয়া শ্যামা লজ্জায় মার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিভার এটা ভালো লাগিতেছিল না। কিন্তু বড় ছেলের সামনে কিছু বলিবার উপায় নাই।

বড় ছেলে বলিল, বেশ থাকুন। কিন্তু চৌকি পাবেন না, চৌকিতে আমার পিসে শুয়েছে। আপনাদের মেঝেতে শুতে হবে।

তা হোক ভাই, তা হোক। ভিজতে না হলেই ঢের। একখান কম্বল-টম্বল–

ওই কোণে চট আছে।

বড় ছেলে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

নীলমণি ঝাঁজালো হাসি হাসিয়া বলিল, দেখলে? তখনি বলেছিলাম শুধু মারতে বাকি রাখবে।

নিভা বলিল, ঘরে যে থাকতে দিয়েছে তাই ভাগ্যি বলে জেনো!

নীলমণি তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলিল, তা ঠিক।

ঘরে অর্ধেকটা জুড়িয়া চৌকি পাতা, বড় ছেলের পিসে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া তাহাতে কাত হইয়া শুইয়া আছে। শ্যামা লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া

চৌকির উপরে আলো পড়ে নাই, তবু এ বাড়ির আত্মীয়কেও ফরাশ তুলিয়া লইয়া শুধু শতরঞ্চির উপর শুইতে দেওয়া হইয়াছে, এটুকু টের পাইয়া নীলমণি একটু খুশি হইল। বড় ছেলের পিসে! আপনার লোক। সে যদি ও-রকম ব্যবহার পাইয়া থাকে তবে তারা যে লাথিঝাটা পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য!

.

চারিদিকে চাহিয়া নীলমণির খুশির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। সুখশয্যা না জুটুক, নিবাত, শুষ্ক, মনোরম আশ্রয় তো জুটিয়াছে। ঘরের এদিকে একটিমাত্র ছোট জানালা খোলা ছিল, নিভা ইতিমধ্যেই সেটি ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাস, বাহিরের সঙ্গে আর তাদের কোনো সম্পর্ক নাই। আকাশটা আজ এক রাত্রেই গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাক, ঝড় উঠুক, শিল পড়ুক, পৃথিবীর সমস্ত খড়ের ঘরগুলি ভাঙিয়া পড়ুক-তারা টেরও পাইবে না।

নীলমণির মেজাজ যেন ম্যাজিকে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত মোলায়েম শোনাইল।

ও শ্যামা, দাঁড়িয়ে থাকিস নি মা, চটগুলি বিছিয়ে দে চট করে। একটু গড়াই। আহা, ভিজে কাপড়টা ছেড়েই নে আগে, মারামারির কী আছে। এতক্ষণই গেল না। হয় আরো খানিকক্ষণ যাবে। ওগো, শুনছ। দাও না, খোকাকে চৌকির একপাশেই একটু শুইয়ে দাও না, দিয়ে তুমিও কাপড়টা ছেড়ে ফেল। গলা নামাইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন, অত লজ্জাটা কিসের শুনি? লজ্জা করলে দরজা খুলে বারান্দায় চলে যাও না!

কাপড় ছাড়া হইল। বাহিরে এখন পুরাদমে ঝড় উঠিয়াছে। ঘরের কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই, কিন্তু বাতাসের কান্না শোনা যায়, চাপা একটানা শাঁ শাঁ শব্দ। তাদের নীলমণি আর তার পরিবারকে, নাগালের মধ্যে না পাইয়া প্রকৃতি যেন ফুঁসিতেছে।

নীলমণির মনে হইল, এ একরকম শাসানো! পঞ্চভূতের মধ্যে যার ভাষা আছে সে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে, আজ বাঁচিয়া গেলে। কিন্তু কাল? কাল কী করিবে? পরশু? তার পরদিন? তারও পরের দিন।

শ্যামা চট বিছাইতেছিল, মাগো কী গন্ধ!

নিভা বলিল, নে, ঢং করতে হবে না, তাড়াতাড়ি কর।

নীলমণি বলিল, ঝেড়ে ঝেড়ে পাত না।

নিভা বলিল, না না, ঝাড়িস নি। ধুলোয় চাদ্দিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

নিভা ছেলেকে স্তন দিতেছিল, কথাটা শেষ করিয়াই সে দমক মারিয়া চৌকির দিকে পিছন করিয়া বসিল।

নীলমণি চাহিয়া দেখিল, বড় ছেলের পিসে চাদর ফেলিয়া চৌকিতে উঠিয়া বসিয়াছে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় পিসের মূর্তি দেখিয়া নীলমণি শিহরিয়া উঠিল। একটা শব যেন সহসা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মতো ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, চোখ যেন অর্ধেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, গালের ঢিলা চামড়ার তলে হাড় উঁচু হইয়া আছে। বুকের সবগুলি পাঁজর চোখ বুজিয়া গোনা যায়। বুকের বাঁ পাশে কি ঠিক চামড়ার নিচেই হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করিতেছে।

পিসে নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছিল। খানিক পরে ক্ষীণস্বরে বলিল, একটা জানালা খুলে দিন।

নীলমণি সভয়ে বলিল, দে তো শ্যামা, জানালাটা খুলে দে।

শ্যামা আরো বেশি ভয়ে ভয়ে বলিল, ঝড় হচ্ছে যে বাবা!

হোক, খুলে দে।

শ্যামা পশ্চিমের ছোট জানালাটি খুলিয়া দিল। ঝড় পুবদিক হইতে বহিতেছিল, মাঝে মাঝে এলোমেলো একটু বাতাস আর ছিটেফোঁটা একটু বৃষ্টি ঘরে ঢোকা ছাড়া জানালাটি খুলিয়া দেওয়ার বিশেষ কোনো মারাত্মক ফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভীরু নিভা ছেলের গায়ে আর-এক পরত কাপড় জড়াইয়া দিল।

পিসে বলিল, ঘুমের ঘোরে কখন চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলেছি, আর একটু হলেই দম আটকাত! বাপ!

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অসুখ আছে নাকি? পিসে ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া বলিল, খুব মোটাসোটা দেখছেন বুঝি? অসুখ না থাকলে মানুষের এমন চেহারা হয়? চার বছর ভুগছি মশায়, মরে আছি একেবারে। যম ব্যাটাও কানা, এত লোককে নিচ্ছে, আমায় চোখে দেখতে পায় না। যে কষ্টটা পাচ্ছি মশায় শত্রুও যেন–

ব্যাপারটা কী?

পিসে রাগিয়া বলিল, টের পান না? এমন করে শ্বাস টানছি দেখতে পান না? পাবেন কেন, আপনার কী। যার হয় সে বোঝে।

বোঝা গেল, পিসের মেজাজটা খিটখিটে।

নীলমণি ভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আহা, সেরে যাবে, ভালোমতো চিকিচ্ছে। হলেই সেরে যাবে।

পিসে বলিল, হুঁ, সারবে। আমকাঠের তলে গেলে সারবে। চিকিচ্ছের কি আর কিছু বাকি আছে মশায়? ডাক্তার কবরেজ জলপড়া–কিচ্ছুটি বাদ যায়নি। আজ চার বছর ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছি, কোনো ব্যাটা সারাতে পারল!

কথার মাঝে মাঝে পিসে হাপরের মতো শ্বাস টানে, এক-একবার থামিয়া গিয়া ডাঙায় তোলা মাছের মতোই চোখ কপালে তুলিয়া খাবি খায়। নীলমণির গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। বাতাস। পৃথিবীতে কত বাতাস! তবুও ফুসফুস ভরাইতে পারে না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া। থাকিয়া ওর দম আটকাইল।

পিসে বলিল, কী করে জানেন? বলে, ভয় কী, সেরে যাবে। বলে, সবাই টাকা নেয় চিকিৎসে করে, শেষে বলে, না বাপু, তোমার সারবে না, এসব ব্যারাম সারে না। আমি বলি, ওরে চোর ডাকাত ছুঁচোর দল! সারাতে পারবি না তো মেরে ফ্যাল, দে, মরবার ওষুদ দে।

উত্তেজনায় পিসে জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল। নীলমণি কথা বলিল না, তার বিদ্রি আরক্ত চোখ দুটি কেবলি মিটমিট করিয়া চলিল।

তেল কমিয়া আসায় আলোটা দপদপ করিতেছে, এখনই নিবিয়া যাইবে। ছেলেকে বুকে জড়াইয়া হাতকে বালিশ করিয়া নিভা দুর্গন্ধ চটে কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

নীলমণির হুঁকা-কলকি শ্যামা জানালায় নামাইয়া রাখিয়াছিল। আলোটা নিবি য়া যাওয়ার আগে নীলমণি বাকি তামাকটুকু সাজিয়া লইল। তারপর ঠেস দিয়া আরাম করিয়া পিসের শ্বাস টানার মতো শাঁ শাঁ করিয়া জলহীন হুঁকায় তামাক টানিতে লাগিল।